জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি

ভূমি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, বাংলাদেশ ১
১. প্রেক্ষাপটঃ ১
২. ভূমি ব্যবহার নীতির উদ্দেশ্যাবলীঃ ১
৩. ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা ঃ ২
৪. কৃষি ও অকৃষি খাতে ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপব্যবহারঃ ৩
৫. বনায়ন ও পরিবেশঃ ৩
৬. ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহঃ ৩
৭. ভূমি ও কৃষি উৎপাদনঃ ৪
৮. ভূমি ও বনাঞ্চলঃ ৪
৯. ভূমি ও গৃহায়নঃ ৫
১০. ভূমি ও শিল্পায়ন ঃ ৫
১১. ভূমি ও জলাভূমিঃ ৬
১২. চা রাবার বাগান ঃ ৬
১৩. ভূমির অন্যান্য ব্যবহার ঃ ৬
১৪. অধিগৃহীত জমির অপব্যবহারঃ ৭
১৫. ভূমি ডেটা ব্যাংক ঃ ৭
১৬. Certificate Land Ownership (CLO) ভূমি মালিকানার প্রত্যায়নপত্র ঃ ৮
১৭. ভূমি ব্যবহার নীতির মুখ্য দিকসমূহ ঃ ৮
১৮. জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণঃ ৯
১৯. প্রশাসনের সক্রিয় কার্যক্রম ঃ ১০

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, বাংলাদেশ

১. প্রেক্ষাপটঃ

১.১ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এদেশের এক তৃতীয়াংশ জাতীয় আয়ের উৎস এবং দুই তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। তাই বাংলাদেশে ভূমি ও পানি সম্পদের গুরত্বও অপরিসীম। ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী, শিল্প-পণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদি সব কিছুরই উৎস। ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টরের বাংলাদেশে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মানুষের বাস, প্রতিজনে মোট ভূমির পরিমাণ গড়ে ২৭ শতক এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৭ শতক মাত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পোন্নয়ন ঘটছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্রমাগত সম্প্রসারণ হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে কৃষির জমির পরিমাণ ক্রমশঃই সংকুচিত হচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ২০.২ মিলিযন একর, যা ১৯৯৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১৭.৫ মিঃ একরে।

১.২ বাংলাদেশ সমগ্র ভূমির শতকরা ৫৩ ভাগ কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত। ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। ভূমি, পানি সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশজ উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে এ তিন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশে এখনও জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে কোন ভূমি ব্যবহার নীতি নেই। তাই যুগোপযোগী বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক খাতের প্রয়োজনে একটি ভূমি ব্যবহার নীতি প্রনয়ণ অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ প্রয়াস।

১.৩ পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জন এবং দেশজ সম্পদের সার্বিক ও রপ্তানীমুখী উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দেশের দুটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ যথা ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। নিবিড় কৃষি কার্যক্রম, মৎস্য ও পশু সম্পদ এবং বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানসহ পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। এই প্রেক্ষিতে ভূমি সম্পদ ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

২. ভূমি ব্যবহার নীতির উদ্দেশ্যাবলীঃ

ক. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কৃষি জমির সার্বিক পরিমাণ বিভিন্ন কারণে উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার বর্তমান ধারা প্রতিহত করা;

খ. ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করা;

গ. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমির প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা;

ঘ. নগরায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জমি অধিগ্রহণপূর্বক তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ পরিহার করা;

ঙ. বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এরূপ জমি বিশেষ করে সরকারি খাস জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

চ. ভূমির ব্যবহার যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা এবং

ছ. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা; এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৩. ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা ঃ

৩.১ নিচের ছক থেকে বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়ঃ

ছক - ১

বাংলাদেশঃ ভূমি প্রাপ্যতা ও ব্যবহার, ১৯৭৪-১৯৯৬

	১৯৭৪	১৯৯০	১৯৯৬	১৯৭৪	১৯৯০	১৯৯৬
	(হাজার একরে)			(মোট জমির শতকরা অংশ)		
মোট জমির পরিমাণ	৩৫,২৮২	৩৭,৫২১	৩৬,৬৬৪	১০০	১০০	১০০
চাষযোগ্য জমির (নিট আবাদি+কৃষিযোগ্য পতিত)	২৩,১৯৯	২৩,২০৯	২১,৫৬০	৬৬	৬২	৫৯
নীট আবাদী	২০,৯৭৭	২১,৮৩৭	১৯,২৮০	৫৯	৫৮	৫৩
কৃষিযোগ্য পতিত	২,২২১	১,৩৭২	২,২৮১	৭	৪	৬
বনাঞ্চল	৫,৫০৮	৪,৫৯১	৫,৩১৫	১৬	১২	১৪
কৃষি অযোগ্য	৬,৫৭৬	৯,৭২১	৯,৭৮৮	১৯	২৬	২৭

তথ্যসূত্র বিবিএস বাংলাদেশ ১৯৯৮

৩.২ কৃষি ভূমি অপসৃয়মান এলাকা এবং চাষযোগ্য জমির অন্যবিধ ব্যবহারের উদ্বেগজনক ছবি নিচের ছক থেকে পাওয়া যাবেঃ

ছক - ২

(হাজার একরে)

	১৯৮৩-৮৪	১৯৯৭
চাষযোগ্য জমি	২২,৬৭৪	২০,২০৯
আবাদি জমি	২০,২৩৮	১৭,৪৪৯
কৃষিযোগ্য পতিত	২,৪৩৬	২,৭৬০
বাড়ীঘর	৮৫৭	১,০২৭

তথ্যসূত্রঃ বিবিএস বাংলাদেশ ১৯৯৮

৪. কৃষি ও অকৃষি খাতে ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপব্যবহারঃ

৪.১ প্রায় তেরো কোটি লোক অধ্যুষিত বাংলাদেশে বিগত বছরগুলিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন উলে- খযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রতি বছরই ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়। প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় ২৫ লক্ষ করে এবং বাড়তি প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪.৫ লক্ষ টন। চাষযোগ্য জমির অপরিকল্পিত বা যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস পাচেছ। ভূমির প্রকৃতি ও গুনাগুণের ভিত্তিতে ফসল বিন্যাস করলে ফলন ভাল হয়। কিন্তু যে জমি ধান চাষের উপযোগী নয় তাতে বারবার ধানচাষ (সড়হড়পঁষঃঁৎব) হচেছ যে কারণে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমাগত অবনতি ঘটছে। অন্যদিকে অপর প্রয়োজনীয় ফসলাদি যেমন-তেলবীজ, ভূট্টা, ডাল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য পরিমিত জমি মিলছে না। ভূমির প্রকৃতি ও গুণাগুণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা মাফিক ভূমি ব্যবহার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৪.২ এদেশের কৃষি ভূমি শুধু কৃষি খাতে বা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচেছ তা নয়। পরিকল্পনা কমিশনের এক হিসাব অনুযায়ী পল- ী অঞ্চলে বিগত ৮০-র দশকে যে ভূমির প্রায় ১৫ ভাগ কৃষক/গ্রামবাসীদের বসতবাটি ও অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হত বর্তমানে তা প্রায় ৩০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া নগরায়ন, শিল্পায়ন, আবাসন, রাস্ঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি খাতেও অনেক জমি ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষি ভূমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচেছ। এসব অকৃষি খাতে ইমারত বানালে ভূমি ব্যবহারের কৃচছতা সম্ভব হবে।

৪.৩ উন্নয়নমূলক অথবা অন্য কোন কাজে ভূমি অধিগ্রহণের সময় অবশ্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা বহু ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে বিপুল পরিমাণ উর্বর কৃষি জমি কৃষি কাজের অযোগ্য ও আওতা বহির্ভূত হয়ে গেছে। অধিগৃহীত ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও অপব্যবহার দুইই চলছে। বিভিন্ন সময় অধিগৃহীত বিপুল পরিমাণ কৃষি ভূমির প্রায় ২৫ ভাগ বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে কিংবা অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হচেছ। ভূমির এ ধরনের অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪.৪ বাংলাদেশের প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে (খাল-বিল, নদী-নালা, প- াবন ভূমি ইত্যাদি) বার্ষিক প্রায় ১৪ লাখ টন মৎস্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু সম্ভবনাময় মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। বর্তমানে ব্যবহৃত উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাসয়গুলোতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথাযথ মৎস্য চাষ করা হলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদন ২০ লক্ষ টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হতে পারে। পশু সম্পদ খাতে প্রায় ২৮ হাজার গরুর খামার ও ৮১ হাজার হাঁস মুরগীর খামারের জন্য প্রায় ৫২ হাজার একর কৃষি ভূমি ব্যবহৃত হচেছ। হাঁস মুরগীর খামার পর্যায়ক্রমে বহুতলা বিল্ডিং-এ স্থাপন করা হলে অনেক জমি কৃষিকাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।

৫. বনায়ন ও পরিবেশঃ

যে কোন দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সমগ্র ভূমির কমপক্ষে ২৫% জায়গায় বনায়ন থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে এর পরিমাণ মাত্র ১৭%। তাছাড়া বনাঞ্চলে অবৈধভাবে গাছ কাটা হচেছ, পার্বত্য বনভূমিতে জুম চাষের দরুন ভূমি ধ্বস হচেছ। এসব কারণে বনাঞ্চল ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচেছ। জুম চাষ ও পাহাড় কাটা ও বনাঞ্চলের গাছ কাটা বন্ধ করা প্রয়োজন। সমন্বিত মাস্টার প- ্যানের মাধ্যমে নিবিড় বনাঞ্চলের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত করা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৬. ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার হয়ে থাকেঃ

ক) কৃষি
খ) গৃহায়ন
গ) বনাঞ্চল
ঘ) নদী, নালা পুকুর, জলমহাল
ঙ) রাস্তাঘাট
চ) রেলপথ
ছ) বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান
জ) চা ও রাবার বাগান, হর্টিকালচার বাগান
ঝ) উপকূলীয় অঞ্চল
ঞ) অন্যান্য

৭. ভূমি ও কৃষি উৎপাদনঃ

৭.১ কৃষি ভূমি সাধারণভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি হলেও এর ব্যবহার সার্বিক জাতীয় ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। এর একটি বিরাট অংশ বর্গাচাষী। এসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নটি অতীব গুরত্বপূর্ণ। ভূমির ব্যবহার এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে এরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কৃষি জমির সার্বিক পরিমাণ বিভিন্ন কারণে উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার বর্তমান ধারা প্রতিহত করতে হবে।

৭.২ জাতীয় কৃষি নীতিতে ফসল উৎপাদনের জন্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সেচযোগ্য কৃষি জমির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। উর্বর কৃষি জমি যেখানে বর্তমানে দুই বা ততোধিক ফসল ফলে বা এমন জমি যা এরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময়, তা কোনক্রমেই অকৃষি কাজের জন্য, যেমন- ব্যক্তিমালিকানাধীন নির্মাণ, গৃহায়ন, ইটের ভাটা তৈরী ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অকৃষি খাতে উন্নয়নমূলক কাজে ভূমির প্রয়োজন হলে এবং তার জন্য অকৃষি খাস জমি পাওয়া গেলে খাস জমি ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে। একেবারেই বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে ন্যূনতম পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি হুকুম দখল করা যেতে পারে।

৮. ভূমি ও বনাঞ্চলঃ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল, মধুপুর অঞ্চল, সুন্দরবন ইত্যাদি কিছু এলাকা ছাড়া বর্তমানে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বনভূমি নিশ্চিহ্ন প্রায়। জনজীবনের সুস্থতা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞগণ স্থলভূমির অন্তঃ ২৫% বনাচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন মনে করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সীমিত বনভূমি দেখা যায় তা এই মানদন্ডের বহু নীচে তদুপরি দ্রুত নগরায়ন, ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা স্থাপন, ক্রটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল ইত্যাদির কারণে যে বায়ুদূষণের সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। বনায়নের উপযোগী ভূমি ও চরভূমিতে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে এই দূষণ প্রক্রিয়াকে বহুলাংশে প্রতিহত করা সম্ভব। রিজার্ভ ফরেস্ট ও অন্যান্য বনাঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন সৃষ্টি এবং বর্তমান বনভূমির সঠিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ ও জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলে সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি আশা করা যায়।

৯. ভূমি ও গৃহায়নঃ

গত কয়েক দশকে শহরাঞ্চলের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং পল- ী অঞ্চল থেকে জনগণের শহরমুখী প্রবাহ ভূমি ব্যবহারের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। অপর দিকে বর্ধিত জসসংখ্যার চাহিদা মেটাতে ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমান বাসস্থান নির্মাণের কাজে ভূমি ব্যবহৃত হচেছ। বাংলাদেশের পার্বাঞ্চলের কিছু এলাকা বাদ দিলে দেশের প্রায় সবটাই সমতল ভূমি। বাসস্থান নির্মাণের আবশ্যকতায় পার্বাঞ্চলের কিছু এলাকা বাদ দিলে দেশের প্রায় সবটাই সমতল ভূমি। বাসস্থান নির্মাণের আবশ্যকতায় স্বাভাবিকভাবেই কৃষি জমি সংকুচিত হয়ে যাচেছ। এই পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলের গৃহায়ন সম্পর্কিত নিয়মকানুন কঠোরতার সাথে প্রতিপালন ছাড়াও গ্রামীণ জনপদগুলিতে বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত জমি ব্যবহার যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে, তার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ ও থানা সদরগুলোতে গৃহায়ন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শহরাঞ্চলের আবাসিক এলাকাতে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ পরিহার করে নগরবাসীদের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও যাতে উর্বর জমিতে গৃহনির্মাণ সংকুচিত করা যায় তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

১০. ভূমি ও শিল্পায়ন ঃ

১০.১ বর্তমান বিশ্বের মুক্ত অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে ব্যাপক শিল্পায়নের প্রচেষ্টা নিতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি অপরিহার্য। বিগত দশকগুলোতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় শিল্প স্থাপনের জন্য বিরাট এলাকা চিহ্নিত করা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশের সর্বত্র এমনকি কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিসিক এস্টেট গঠনের জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের আনুকূল্যে স্থাপিত এই সব শিল্প এলাকা (শিল্প নগরীতে) বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশিত শিল্প স্থাপন ও উৎপাদন কার্যকর হয়নি। বহু এলাকা ভিন্নতর কাজে ব্যবহৃত হচেছ। বিশেষ করে বিসিক এলাকাগুলোতে দেখা যায় অধিগৃহীত জমির প্রায় সবটাই কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্যদিকে শিল্প নগরীতে খালি প- ট থাকা স্বত্ত্বেও শিল্প উদ্যোক্তারা হয় প্রয়োজনীয় জমি পাচেছ না অথবা সেখানে শিল্প স্থাপনে তাঁরা যে কারণেই হোক উৎসাহী নন। অনেক শিল্প নগরীর বাইরে কিন্তু অল্প দূরত্বে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে উৎপাদন করছেন।

১০.২ বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিতব্য কলকারখানার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি উপাদান গুরত্ব পেয়ে থাকে তার মধ্যে সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর রেয়াতের সুবিধা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরবিছিন্ন ও পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি অন্যতম। সাধারণভাবে দেখা যায় যে প্রধান সড়ক গুলোর পাশেই মূলতঃ শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে বলে মনে হয়। দেশের প্রধান সড়কগুলোর দুপাশে আনুমানিক ৫০০ গজ জায়গা ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখা; বিসিক এস্টেটগুলোতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প- টের মালিকরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী না হলে বা অপারগ হলে ঐ প- টগুলো পুনঃগ্রহণ করে আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিল্প উৎপাদনে যাওয়ার শর্তে বরাদ্দ প্রদান; বিসিক শিল্প নগরীতে স্থান সংকুলান হলে এর ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোন ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সচেষ্ট হতে পারে।

১১. ভূমি ও জলাভূমিঃ

১৭.১ এদেশের ২৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথ, অসংখ্য হাওড়, বাওড় বিল আর পুকুর বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য উৎপাদনের জন্য উর্বর ক্ষেত্র। মৎস্যচাষ ছাড়াও এগুলো নৌপথ পরিবহন, বন্যার পানি নিষ্কাশন, সেচ পানীয় জল, প্রক্ষালন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাপ্তাই হ্রদের পানি দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে একসময় পর্যাপ্ত মৎস্য সম্পদ আহরিত হতো। নদী খাল বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের তাগিদে বিগত বছরগুলোতে ব্যাপকহারে কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটছে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। আশংকা করা হচেছ যে বেশ কয়েক ধরনের মাছ এদেশ হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা বিলুপ্তপ্রায়।

১৭.১ নদীগুলোতে ক্রমাগত পলিমাটি গড়া, যেখানে সেখানে মাটি ভরাট, নিচু এলাকায় পানির স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত করে রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি কারণে জলাভূমি ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে। এর ফলে নিম্নলিখিত সমস্যার উদ্ভব ঘটে ঃ

ক. বর্ষাকালে বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি;
খ. শুষ্ক মৌসুমে নৌ-চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানির অভাব;
গ. সীমিত মৎস্য চাষ;
ঘ. সেচের জন্য অপর্যাপ্ত পানি;
ঙ. লবনাক্ততা সমস্যার সৃষ্টি;
চ. জলাবদ্ধতা সমস্যার সৃষ্টি;
ছ. কাপড় কাঁচা, গোসল করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য পানির স্বল্পতা।

১৭.১ মৎস্য উৎপাদনের জন্য চিরাচরিত ক্ষেত্র, যথা, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি কোনভাবেই যাতে প্রতিকূলতা সম্মুখীন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর অনেক জায়গা গ্রীষ্মকালে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এগুলোকে ব্যাপক হারে কৃষি জমিতে রূপান্তর করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শুধুমাত্র কৃষি জমির আয়তন বাড়ালেই সমস্যার সমাধান ঘটবে না, বরং তাতে নানাবিধ সমস্যা যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া, জনগণ কর্তৃক মাছজাত প্রোটিন গ্রহণে ঘাটতি ইত্যাদির সৃষ্টি হবে। জাতীয় কৃষি নীতিতে উল্লি- খিত পন্থা অনুসরণ করে ফসল উৎপাদনের প্রয়াস নিতে হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জলাভূমির প্রকৃতিগত পরিবর্তন পানি পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে পরিহার করা উচিৎ। জাতীয় মৎস্য নীতির আলোকে জলাভূমির সদ্ব্যবহার করতে হবে।

১২. চা রাবার বাগান ঃ

বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত চা বাগানগুলো আমাদের রপ্তানী আয়ের একটি উল্লে- খযোগ্য উৎস। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য কিছু এলাকায় রাবার বাগান আছে। এছাড়া আছে ফলের বাগান। এইসব বিশেষ ধরনের বাগানের সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হবে। এরজন্য যে জমি বর্তমানে ব্যবহৃত হচেছ বা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত আছে তা এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত জাতীয় নীতির বহির্ভূত কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এসব জমিতে বিদ্যমান মূল্যবান গাছ নির্বিচারে সংহার করা যাবেনা এবং জমির স্বাভাবিক উর্বরতাও বিনষ্ট করা চলবে না।

১৩. ভূমির অন্যান্য ব্যবহার ঃ

উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও আরো বহুবিধ কারণে ভূমির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচেছ। দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্বার্থে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা যথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, হাট বাজার, অফিস আদালত নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের কার্য ও আবাসস্থল ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক এধরনের স্থাপনা নির্মাণের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হচেছ। বিদ্যমান স্থাপনার অতিরিক্ত স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে অনায়াসে একট সীমারেখা টানা যেতে পারে। বিদ্যমান স্থাপনার আয়ত্বাধীন সম্পৃর্ন জমির পর্যাপ্ত ব্যবহার প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে। তারপরেও যদি বাড়তি জমির প্রয়োজন হয় তবে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্ট নিতে হবে।

১৪. অধিগৃহীত জমির অপব্যবহারঃ

১৪.১ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ইতপূর্বে অধিগৃহীত জমির প্রায় এক চতুর্থাংশ বর্তমানে অব্যবহৃত অথবা অবৈধ দখলে অথবা অপব্যবহৃত অবস্থায় আছে। প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে সংশি- ষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতায় এসব জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। উদ্ধারকৃত জমি সরকার খাসজমি হিসেবে সহজেই পুনঃগ্রহণ (ৎবংঁসব) করতে পারে। খাসজমির তালিকায় পুনঃগৃহীত জমির উলে- খসহ অন্যান্য পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করে তা নিয়মিতভাবে সংশোধন করতে হবে।

১৪.২ ভূমি অধিগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পে অধিগৃহীত জমির বহুমুখী ব্যবহার (গঁষঃরঢ়ঁৎঢ়ড়ংব টংব) করার লক্ষ্যে সংশি- ষ্ট আইনের সংশোধন আনয়ন করা যেতে পারে। প্রকল্পের স্বার্থে প্রয়োজন কিন্তু বাস্তবে অব্যবহৃত এধরনের জমিতে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সহায়ক কার্যক্রম যথা শস্য চাষ, যথোপযুক্ত বৃক্ষ রোপন, পশু পালন হাঁসমুরগীর চাষ ও মৎস্যচাষ করা যেতে পারে।

১৪.৩ বাস্তব সত্য এই যে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য জমির প্রাপ্যতা ক্রমশঃ সংকুচিত হচেছ। খাসজমি হিসাবে লিপিবদ্ধ জমিরও বিশেষ করে অকৃষি খাসজমি আইন ও পদ্ধতির ফাঁক ফোকর গলে ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে একদিন হয়ত দেখা যাবে যে, সরকারের খাস জমি বলে কিছু নেই বা খাতায় থাকলে বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই।

১৪.৪ পৃথিবীর ঘনবসতি দেশগুলি অন্যতম হল বাংলাদেশ। অন্যান্য সম্পদে সীমাবদ্ধতা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দিয়ে হয়ত কাটিয়ে উঠা যায়। নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার কারনে মোট জমির পরিমাণ বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। সকাল থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে চর জাগে তার প্রাপ্যতা সার্বিক প্রেক্ষাপটে তেমন গুরত্বপূর্ণ নয়। কৃত্রিম উপায়ে সমুদ্রে বাঁধ দেশের ভূখন্ডের সম্প্রসারণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে কার্যকর। ফলশ্রুতিতে আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিদ্যমান ভূসম্পদের ভিত্তিতেই মূলতঃ করতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য বর্তমানে লভ্য জমির বিশেষ করে খাস জমির সংরক্ষণ তাই বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে।

১৫. ভূমি ডেটা ব্যাংক ঃ

১৭.১ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যে সব জমি আছে সেগুলোর বর্তমান ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটা তথ্যভিত্তিক ভূমি ডেটা ব্যাংক চালু করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে এটা প্রণীত হবে নিম্নলিখিত সূত্রসমূহ থেকে সংগৃহীত ভূমি ডেটা সংরক্ষণ করা হবেঃ

ক. অব্যবহৃত সরকারী খাস জমি;
খ. পতিত জমি;

গ. অধিগৃহীত জমি যা অব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক পুনঃগৃহীত (ৎবহঁসবফ);
ঘ. ভবিষ্যতে কোন বিশেষ কর্মকান্ডের জন্য নির্দিষ্ট এমন অধিগৃহীত জমি;
ঙ. পয়স্থি চর (নদী থেকে জেগে উঠা চর) এবং
চ. সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা জমি।

১৫.২ সরকারী খাস জমির (কৃষি ও অকৃষি) ব্যবহার ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত কৃষি ও অকৃষি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার বিধৃত নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিযোগ্য খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান একটি গুরত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কিন্তু অকৃষি খাসজমির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটানোর জন্য এর সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। মূলতঃ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য এর ব্যবহার সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৫.৩ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেট এবং ঢাকা ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর মালিকানায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ শহরে কয়েক হাজার একর মূল্যবান সম্পত্তি আছে। কালক্রমে এসব সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের আয়ত্বে চলে গেছে। এগুলিকে পুনরুদ্ধার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.৪ সরকারী স্বায়ত্বশাসিত ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকান্ডের নিমিত্ত প্রায়শই স্থাপনা নির্মাণ প্রয়োজন হয়। প্রচলিত বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশি- ষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করা হয়। ভূমির স্থানীয় প্রাপ্যতার আলোকে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রস্তাবিত ভূমি ডেটা ব্যাংক চালু হলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রথমেই খাস জমির প্রাপ্যতা পরীক্ষা করা হবে। উপযুক্ত খাস জমি পাওয়া গেলে সেটাই বন্দোবস্ত দেয়া শ্রেয় হবে।

১৫.৫ ভূমি ডেটা ব্যাংকে তালিকাভুক্ত খাস জমি যদি একান্ত ব্যবহারের উপযুক্ত বিবেচিত না হয় তাহলে জেলা প্রশাসক ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য সচেষ্ট হবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অধিগৃহীতব্য জমি কোনক্রমেই সেচযোগ্য বা উর্বর কৃষি জমি না হয় এবং জমির পরিমাণ ও ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে।

১৬. Certificate Land Ownership (CLO) ভূমি মালিকানার প্রত্যায়নপত্র ঃ

ভূমি প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থায় জমির মালিকানা স্বত্ব কোন একটি ডকুমেন্টের উপর নির্ভরশীল নয়। রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, জমির পর্চা এবং সার্ভে ও জরিপ রেকর্ডে নামভুক্তি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ। এতে একদিকে যেমন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও মামলা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ভূয়া দলিলের মাধ্যমে নামজারিসহ বিভিন্ন হটকারিতার শিকার হয় নিরীহ জনগণ। এই অবস্থা নিরসনকল্পে একটি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য একক দলিল প্রদানের মাধ্যমে ভূস্বামীর স্বত্ত্ব নিশ্চিত করার প্রয়াস নেয়া হচেছ। ঈবৎঃরভরপধঃব খধহফ ঙহিবৎংযরঢ় (ঈখঙ) স্কীমটি সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হলে খাসজমির ব্যাপকহারে ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাওয়ার বর্তমান প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস করা যাবে বলে আশা করা যায়। ভূমি ডেটা প্রণয়ন ও নিয়মিত আপডেটিং এর ক্ষেত্রে ঈখঙ স্কীমটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।

১৭. ভূমি ব্যবহার নীতির মুখ্য দিকসমূহ ঃ

১৭.১ কৃষি জমির ব্যবহার যতটুকু সম্ভব কৃষি কাজে সীমিত রাখতে হবে;
১৭.২ কৃষি জমি অনাবাদী ফেলে রাখা যাবেনা;
১৭.৩ অনুপস্থিত কৃষি জমি মালিকদের জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
১৭.৪ কৃষি জমির ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া একটি যৌক্তিক পরিমাণে সীমিত রাখতে হবে;
১৭.৫ কৃষি জমি কৃষি ভিন্ন অন্য কাজে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে;
১৭.৬ শহর এলাকায় আবাসনের জন্য পরিবারভিত্তিক জমির সিলিং নির্ধারণ করতে হবে;
১৭.৭ রাজধানী, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও উপজেলা কেন্দ্রের জন্য আবাসন জমির সিলিং পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে হবে;

১৭.৮ শহর এলাকায় আবাসনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে হাউজিং এরিয়া উন্নয়নের পরিবর্তে Land Readjustment, guided landi developments Area development plan ইত্যাদি বাস্ত সম্মত কৌশল অবলম্বনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

১৭.৯ গ্রামীণ আবাসনের জন্য পরিবারভিত্তিক জমির সিলিং নির্ধারণ করতে হবে;

১৭.১০ গ্রামীণ এলাকার জন্য মডেল হাউস নির্মাণ উৎসাহিত করতে হবে;

১৭.১১ আবাসনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে একতলা ভবনের পরিবর্তে বহুতল ভবন নির্মাণকে উৎসাহিত করতে হবে;

১৭.১২ বন ও পরিবেশ মন্ণালয় কর্তৃক ঘোষিত বনাঞ্চল বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত থাকবে;

১৭.১৩ বর্তমানে ব্যবহৃত বনভূমির সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.১৪ বনভূমির জন্য নির্ধারিত ভূমির শ্রেণী পরিবতন প্রতিরোধ করতে হবে;

১৭.১৫ উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যকরভাবে বনাঞ্চলের সবুজ বেষ্টনী সৃজন করতে হবে;

১৭.১৬ সামাজিক বনায়নকে উৎসাহিত করতে হবে;

১৭.১৭ বিদ্যমান জলাশয় উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং তা ভরাট করা যাবে না। এ দায়িত্ব ব্যক্তিমালিকানাধীন ছোট পুকুরের ক্ষেত্রে সংশি- ষ্ট মালিকের উপর এবং বৃহৎ জলাশয় যেমন নদী, খাল, হাওড়, বাওড় এবং বিল-এর দায়িত্ব ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠি ও সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জলাশয়সমূহের নিয়মিত সংস্কার ও পুনঃ খনন প্রয়োজন হবে;

১৭.১৮ যতদূর সম্ভব বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধকে সড়ক/রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হবে;

১৭.১৯ বাঁধে পরিকল্পিত উপায়ে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণ করতে হবে;

১৭.২০ বাঁধ নির্মাণের জন্য খননকৃত খাদ/গহবর জলাশয় হিসেবে মৎস্য উৎপাদন ও হাঁস পালনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরী করতে এ বিষয়ে নতুন জলাশয় সৃষ্টি করে আশেপাশে অবস্থিত ভরাট জলাশয় পুনঃখনন করে বাঁধের প্রয়োজনীয় মাটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৭.২১ বাঁধ নির্মাণের ফলে যাতে করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.২২ সড়ক ও জনপথ নির্মাণ কাজে বসতবাড়ি এবং উর্বর কৃষি জমি যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে;

১৭.২৩ নতুন শিল্প কারখানা শিল্পাঞ্চলের সন্নিকটে করা যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে বসতবাড়ি ও উর্বর কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়;

১৭.২৪ কোন নির্দিষ্ট প্রকৃতির শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য চিহ্নিত অঞ্চলে শুধুমাত্র সেই প্রকৃতির শিল্প কারখানাই স্থাপনযোগ্য হবে;

১৭.২৫ শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন/নির্গমনের যথাযথ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে ভূমি বা পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয়;

১৭.২৬ দেশের প্রধান সড়কগুলোর দুপাশে আনুমানিক ৫০০ গজ জায়গা ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখা যেতে পারে;

১৭.২৭ বিসিক শিল্প নগরীতে স্থান সংকুলান হলে এর কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোন ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করতে হবে;

১৭.২৮ চা-বাগান রাবার বাগান ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত জমি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চা বাগানের জমি কোন অবস্থাতেই চা-চাষ বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

১৮. জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণঃ

কোন জাতীয় নীতিই পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা যায় না যদি না বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কাছে কোন এটা বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। ভূমি নীতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দেশে কৃষি জমির সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের অপরিহার্যতা, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ব্যাপক মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয়তা, বনায়ন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যাবে না। মানুষ যখন এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ হবে তখন গৃহনির্মাণের জন্য তার উর্বর ভূমিখন্ড সে সহজে ব্যবহার করবে না। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সে নিজের থেকেই সচেষ্ট হবে।

১৯. প্রশাসনের সক্রিয় কার্যক্রম ঃ

জাতীয় ভূমি নীতি সম্বন্ধে প্রশাসনের সকল স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা স্ব স্ব কর্মকান্ডে এর প্রতিফলন ঘটাবে। বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে যাতে ভূমি নীতিতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভূমির বাস্তবানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।